উপসংহার

প্রতিটি মানুষ জীবনের সঙ্গে তার সৃষ্টিকে স্মরণীয় করে তোলে। কবি জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন -

"কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবু নিবিড় অর্ন্তভেদী
দৃষ্টিশক্তি রয়ে গেছে মানুষকে মানুষের কাছে ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করার"।

এই দৃষ্টিশক্তির মধ্যে দিয়েই জীবন হয়ে ওঠে যেন এক শিল্পাকৃতি। আর সেই শিল্পের মানুষ হয়ে ওঠে যুগের প্রতিবিম্ব। তাই আমরা বলতে পারি জীবন শিল্পীর কল্পনায় মুক্ত হয়ে ওঠে। এই মুক্ততা এক সূত্রে গ্রথিত করে মুক্তি দেয় মানুষের অন্তরের সুপ্ত কামনা বাসনার নূতন ভাব চেতনাকে। চেতনার আকাশ মানুষেরই মনের রূপময় আত্ম প্রকাশ। তাই সাহিত্যকে বলতে পারি জীবনের আয়না। এক কথায় সাহিত্যের বিষয়বস্তু হলো মানব জীবনের সামগ্রিক ছবি। তাছাড়া মানব সত্ত্বা প্রতি মুহূর্তে নূতনের মোহে পুরাতনের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিতে চায়। তবে তা কখনও পুরোপুরি অনন্ত জীবনের ধারাকে বয়ে আনে না। সমকালীন বিষয়কে অবলম্বন করেই সাহিত্যিকেরা গতিশীল চিন্তা ও শিল্প প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার শিল্প সত্ত্বার মূল উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেন।

এই গতিশীল চিন্তার প্রবাদপ্রতীম পুরুষ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর উপন্যাস যেন নগর ও বিশ্বমানবের প্রেক্ষাপটে নর-নারীর জীবনের গতি প্রতিটি কামনার বিন্দু দিয়ে সাজানো এক শিল্পমূর্তি। আর এই সজ্জিত শিল্পে জীবনের চেতনার আকাশ ছোঁয়া অনুরাগ, যৌন কামনা, দাম্পত্য ভাবনাগুলি সমকালের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাস সাহিত্যে স্বতন্ত্র শিল্প ভাবনা হিসাবে মান্যতা পেয়ে যায়। অভিনব শিল্প কর্মের আঙ্গিকে উপন্যাসগুলি প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করেছে বলেই নূতন রূপ, ভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে ভরা নর-নারীর অর্ন্তমুখী ভাবনা বুদ্ধদেবের সাহিত্যে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। উপন্যাসে

তার জীবন আদর্শের নূতন রূপ ও ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কালজয়ী হয়েছে। যেমন মৌলিনাথ (মৌলিনাথ উপন্যাসে) শ্রীপতি (নীলাঞ্জনের খাতা), বীরেশ্বর (শেষ পাণ্ডুলিপি) প্রভৃতি চরিত্রগুলি উপন্যাসে জীবন ও যৌবনের উদার স্বাধীনতায় ব্যক্তি মানুষের ভিন্ন সত্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি।

মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সত্তাকে তুলে ধরে। সাহিত্যিকরা ঐ নব সত্তার আলোয় জগৎ ও জীবনকে দেখতে চায়। জীবনের পরিধি সাহিত্যিকের শিল্পের ক্যানভাসে হয়ে ওঠে কালজয়ী। সব মানুষের আবেদন উপন্যাসে থাকে বলেই জীবন ও কালের প্রেক্ষাপটে ঐ- ভাবনারই প্রতিবিম্ব বুদ্ধদেবের উপন্যাসে এক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নাগরিক জীবন উপন্যাসে পেল মুক্তি। ঢাকা ও কলকাতা নগর উপন্যাসের প্লটে স্থান পেয়েছিল। নর-নারীর বিচরণের গণ্ডী ঐ দুটি শহরের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। বুদ্ধদেব মানুষের সুখ দুঃখের মধ্যে জীবনের দেহজ কামনার আকর্ষণ চরিত্রের শিরায় শিরায় নীরব অনুভবে তুলে ধরেছিলেন। একদিকে এই নগর জীবনের আভাস অন্যদিকে দাম্পত্য জীবন আলাদা মাত্রা পেল তাঁর উপন্যাসে। দাম্পত্য জীবনের এই নব মূল্যায়ন সমগ্র কথাসাহিত্যে বুদ্ধদেব আলাদা স্বাদ এনেছিলেন।

পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে আতঙ্কিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে মেয়েদের মেলামেশায় যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল তা বুদ্ধদেব উপন্যাসে দেখালেন। সমকালীন যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে নর-নারীর জীবন যন্ত্রণা যে অন্তরের মধ্যে লুকায়িত ছিল তা বেদনার কালো ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল। এই পরিবেশ থেকেই নিঃসঙ্গ জীবনের অস্থিরতা তাঁর উপন্যাসে স্বতন্ত্র এক জগৎ তৈরী করল। এই স্বতন্ত্রতা অবশ্যই তাঁর জীবন থেকে উঠে আসা ঘটনায় কিছু প্রতিফলন আয়নার মতো তাঁর উপন্যাসে দেখি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি দেহ কামনার উচ্ছ্বাসে

ভরা শতদলের মতো। উপযুক্ত পরিবেশের অপেক্ষায় তারা যেন অপেক্ষমান। গল্প বলার পরিবেশ দিয়েই তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পাপড়িগুলি বিকশিত হয়েছিল। জীবন জিজ্ঞাসাকে বাদ দিয়ে যে উপন্যাস হতে পারে না, যৌন জীবনকে অস্বীকার করার অর্থই জীবনের কোন এক দিককে ব্যাহত করা- এই দিকগুলি বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন। এই সত্যতার দিকটি তিনি শিক্ষিত মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ করেই তুলে ধরেছিলেন। যা সেকালে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র এ পথে পথপরিক্রমা করলেও বুদ্ধদেবের কল্পজগতের ধারে কাছে তাঁরা আসতে পারেন নি। এই মানসিকতা সেকালে অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে কতটা আলাদা ছিল তা আলোচনা করা দরকার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনাতে আধুনিকতা প্রবলভাবে সাড়া তুলেছিল। তাঁর গোড়ার দিকের রচনায় যৌন বিষয়ে একটা বে-আব্রু মনোভাবও দেখা যায়। জীবনের বহিঃভাগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উপেক্ষা করে বুদ্ধদেবের মতো অচিন্ত্যকুমারও নৈর্ব্যক্তিক আত্মার অবগুন্ঠন উন্মোচনে ব্যস্ত। সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা শতধাখন্ডিত, ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছদ্মবেশাবৃত আত্মার, জ্যোতির্ময় ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ তার উপন্যাসের দর্পণে ধরা পড়ে। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসের মধ্যে আকস্মিক (১৯৩০ খ্রীঃ), কাক জ্যোৎস্না (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) ইন্দ্রাণী (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), উর্ণনাভ (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), নবণীতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), আসমুদ্র প্রভৃতি উপন্যাসে ঐ চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করি। এই প্রতিফলন প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসেও একটি অভিনব ভঙ্গিতে উঠে আসে। কারণ প্রেমেন্দ্র মিত্র, কল্লোল গোষ্ঠীর একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার-এর সহগোষ্ঠীভুক্ত লেখক হয়েও ভাব-ভঙ্গিতে উপন্যাস ক্ষেত্রে অনেকটা বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস অনেকটা বাস্তবধর্মী । অহেতুক কাব্যধর্মী উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে কাহিনীতে নূতন ভাবের অভাব তিনি ঘটাতে চান নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস "পাঁক"-এ দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর কুৎসিত জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "মিছিল" - এ দেখা যায় নারী নির্যাতনের একটি নিষ্ঠুর ও বাস্তব কাহিনী। তিনি "কুয়াশা" উপন্যাসে আরো অনেকখানি পরিণত বিষয়ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে তাঁর পরিকল্পনা শক্তির নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। পরবর্তী জীবনে তিনি বিচিত্র রসের নানা উদ্দীপক কাহিনি লেখেন। কল্লোল কালের লেখক দের পথেই হাঁটলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। তিনি উপন্যাসের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নূতনতর ভাব ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক। যে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ থাকলেও তাতে ছিল না

কোন দেহগত আকর্ষণ। তাঁর উপন্যাসে বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনের মধ্যে মান-অভিমান বা আবেগ-অনুরাগের সর্বপ্রকার উত্তেজনা পরিহার করে নর-নারীরা বাস করে। প্রবোধকুমারের বিখ্যাত "প্রিয় বান্ধবী" উপন্যাসে এরূপ একটি পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা পরিলক্ষিত। তাঁর "অগ্রগামী" উপন্যাসেও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এরূপ একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। উপন্যাস রচনায় এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সেকালের উপন্যাস সাহিত্যে আলাদা তাৎপর্য এনেছিল। কিন্তু প্রবোধকুমারের উপন্যাসে নায়কদের নারী স্পৃহাহীনতা সেকালের লেখকদের থেকে পৃথক ছিল বলা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা স্বভাবতই উঠে আসে। তাঁর রচনাতে প্রথম থেকেই সেক্স ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব দেখা যায়। বাল্যকাল থেকেই তিনি নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সঙ্গে সহজাতভাবে মেলামেশা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের দরিদ্র মানুষদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রার ছবিও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যৌন বিকারের যে চিত্র তিনি দেখিয়েছেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায় "পুতুলনাচের ইতিকথা" উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস "পদ্মানদীর মাঝি" (১৯৩৬ খ্রীঃ)। এই উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিকতার ফ্রেমে নর-নারীর সম্পর্কের দিকটি উপন্যাসে বার বার তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া "জননী" (১৯৩৫ খ্রীঃ) "দিবা রাত্রির কাব্য" (১৯৩৫ খ্রীঃ), "শহরতলী"(দুই পর্ব) "সোনার চেয়ে দামী", "শহর বাসের ইতিকথা" (১৯৪৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের জৈবিক কামনা-বাসনার দিকগুলি তুলে ধরেছিলেন। সমকালীন যুগের বলয়ে ঘূর্ণিয়মান লেখকদের থেকে বুদ্ধদেব বসু একটু যেন ভিন্ন পথে পাড়ি দিলেন। যে পথ তাঁর কর্মমুখর বাস্তব জীবন বহির্ভূত এক কল্পনার রঙ্গীন দেশ। সে দেশের নর-নারীরা ছিল লেখকেরই অকৃত্রিম সৃষ্টির ফসল।

আবার বুদ্ধদেবের উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতিতে জগৎ ও জীবন যেভাবে ধরা পড়ে, তাতে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অন্তর্জগতে বার বার যেন কিছু জিজ্ঞাসা করে। তিনি উপন্যাস জগতে একটি বিশেষ পরিস্থিতির মাঝে আমাদের মানবিক যাত্রাপথকে কিছুটা তুলে ধরেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর এই আদর্শ রচনার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত ছিলেন। শেষ গ্রন্থেও তাঁর এই প্রস্তুতি ধরা পড়ে। তাঁর সৃষ্ট "সানন্দা" ও "আমার বন্ধু" উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই "হঠাৎ আলোর ঝলকানি", "অদৃশ্য শত্রু" ও "কঙ্কাবতী"র কিছু কিছু কবিতাও ঐ সময় লেখা হয়েছিল। এই সব গল্প, উপন্যাস ও কবিতা পরবর্তী লেখকদের রচনার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া উপন্যাসের

সংলাপ, গদ্য, বাক্যগঠন, শব্দ চয়ন - এইগুলিই হল লেখকের মূল আত্মপ্রকাশের পথ। নাটক আর কবিতাতে তিনি যে মনের পরিচয় দিয়েছিলেন, উপন্যাস সাহিত্যে তিনি নূতন রীতি প্রয়োগে ততটা সচেতন ছিলেন না।

এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের কথাসাহিত্যিকদের আঙ্গিক রীতিতে বিষয় ভাবনাগুলি কিভাবে উঠে এসেছিল তা দেখা যেতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে সামাজিক ও পারিবারিক সংগ্রামের ছবিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিকতা ইতিহাসের মোড়কে আবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতিরও পরিবর্তন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের প্রকরণে যে নূতনত্ব পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তা থেকে আলাদা। আবার কল্লোলকালের কথাসাহিত্যিকরা উপন্যাসের নর-নারীর আচার আচরণের যে বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলেন, তা অন্য ধরনের। এই কালের লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সমাজের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের পরিচয় উপন্যাসে তেমনভাবে দেখালেন না। তিনি ভূমিহারা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মানুষের জীবন যন্ত্রণার ছবি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। তিনি উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় ও আঙ্গিকে জৈবিক দেহ কামনাকে গুরুত্ব দিলেন। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, ব্যক্তি মনের জিজ্ঞাসা ও যৌন জীবনের চাহিদা তাঁর উপন্যাসে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব পেল। নর-নারীর ব্যক্তি সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজ নিরপেক্ষ আত্মশক্তির নূতন রূপকার তাকে বলা যেতে পারে। যুব চিত্তের মধ্যে তখন যে অস্থিরতা ছিল তা প্রকাশ করতে গিয়ে যৌনতাকে উপন্যাসে তিনি অস্বীকার করেন নি। আর এটাই ছিল সেদিনের হতাশাগ্রস্ত জীবন থেকে নর-নারীর মুক্তির পথ।

বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসে চরিত্রের মনের ভেতরে ডুব দিতে চেয়েছিলেন। এটা অবশ্য বুদ্ধদেবের কবিতা, নাটক, ছোটগল্প যেকোন রচনারই মূল বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। কারণ তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তবে একথা ঠিক যে, মনের ভিতরে ডুব দিয়ে দেখাটাই বুদ্ধদেবের স্বভাব। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের নর-নারীরা তাই ব্যক্তির নৈঃসঙ্গের জগতে একা একা ঘুরে বেড়ায়। তাদের কথাবার্তায় শূন্যতাবোধের পরিচয় মেলে। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভালোবাসা ও ব্যর্থতার মধ্যে আধুনিক সমাজের শূন্যতা ও হৃদয়ের রিক্ততার ছবি ফুটে উঠেছে। জীবনের এই শূন্যতার ছবি তুলে ধরতে গিয়ে বুদ্ধদেব সেকালের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কাছে প্রেমের স্বরূপ কি ছিল তা দেখিয়েছেন। এই শ্রেণীর মানুষের জীবনে প্রেমের ছবিটি গতানুগতিক ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি।

সেকালের পটভূমিতে বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নর-নারীরা যেভাবে চলাফেরা করেছিল তা কখনই বাস্তব বর্জিত বলে মনে হয় না। তাই কালের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় চরিত্রগুলি প্রেম-বিরহ বাস্তবতার সংস্পর্শে এলেও মাঝে মাঝে বাধা পেয়েছিল লেখকের কবি স্বভাবের জন্য। কবিত্ব ও নায়ক-নায়িকাদের কবিতা লেখার ঝোঁক তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই দেখা যায়। যার ফলে বাঁধাধরা যান্ত্রিক জীবনের ছকে নির্দিষ্ট শহর ও নগরের এলাকায় বুদ্ধদেবের উপন্যাসের পাত্র পাত্রীরা চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। তাই প্লট বা কাহিনির জটিলতায় তাঁর উপন্যাসের নর-নারীরা মাঝে মধ্যেই দিশেহারা বোধ করেছিল। এখানেও লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তৎকালীন সমাজ জীবনের ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্যতার দিকগুলি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই মানসিকতায় চরিত্রগুলি দেহ কামনাকে বর্বরের মতো উপভোগ করতে দেখা যায়। তিনি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে এই দিকগুলি বিশেষ করে দেখিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর উপন্যাসে অশ্লীলতার বিষয়গুলি মাঝেমধ্যেই উঠে এসেছিল।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস নিয়ে অনেক সমালোচক যাই বলে থাকুক না কেন একটি বিষয়ে সবাই একমত ছিলেন যে, তাঁর মানসিকতাই ছিল আত্মকেন্দ্রিক ও অর্ন্তমুখী। এছাড়া মনোময়তা ও বিষাদই ছিল বুদ্ধদেবের অধিকাংশ উপন্যাসের মূল সুর। "যবনিকা পতন" উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডর প্রথম পরিচ্ছদে ইলার দুঃখবিলাস সম্পর্কিত মন্তব্যে আমরা দেখি -

"যদি খানিক্ষণের জন্য দুঃখের লাগাম একেবারে ছেড়ে দেওয়া যায়, যদি নিজেকে নির্যাতন করে মনের দুঃখানুভূতির ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত খরচা করা যায়, তাহলে সেই ক্লান্তি থেকেই উদ্ভূত হয় নতুন উপভোগস্পৃহা। জীবনের রুচি ফিরে আসে"। সেই বয়সেই বুদ্ধদেব তাঁর এই নায়িকাকে দিয়ে ভাবিয়েছিলেন - "উভলিঙ্গ পতঙ্গের মতো জীবন বার বার নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করে ; পরম ক্ষয়ের মুহূর্তেই প্রাণ পুনরুজ্জীবিত হয়।" - ১

বুদ্ধদেবের উপন্যাসে সে কালের কিশোরী নায়িকারাও কতো যে চিন্তাশীল ও উপভোগপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়। সেকালের সমাজ ব্যবস্থাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। প্রেম নিবেদনের বিষয়কে উপন্যাসে স্থান দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে আদালত পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। কিন্তু আজকের সভ্যতায় তা

বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে সেই আধুনিকতার অনেক লক্ষণ পরিস্ফুট। কিন্তু কল্লোলীয় চেতনা বুদ্ধদেবকে এই আধুনিকতা আনতে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। কেবল কল্লোলের লেখাই নয়, সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এই নূতন চেতনা আনতে সাহায্য করেছিল। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালি কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়, কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উঁচু তটভূমি মাত্র" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা/পৃ ঃ৪৫১)। আবার ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন "বুদ্ধদেবের তাবৎ গল্প উপন্যাসে তাঁহার নিজেরই যেন আত্মবিস্তার" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস/ চতুর্থ খণ্ড/পৃঃ ১২০)।কিন্তু তাঁর সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু যে ভিন্ন খেয়ালী কল্পনার স্বতন্ত্র ছিলেন সে সম্পর্কে কোন বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা পূর্বে পাই না। সমালোচকদের বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সম্পর্কে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের মধ্যে সমালোচকরা কাব্যময়তার দিকেই বারবার ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে দেখা যায় এই জটিল সময় প্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত আধুনিক মন নিয়েই তিনি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তিনি যে অশ্লীল ও যৌনতাকে উপন্যাসে নর-নারীর মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে মানসিকতা এসেছিল শুধু সাহিত্যের দিক দিয়ে নয়, তিনি মনে প্রাণে এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তা না হলে একই অভিযোগে সমরেশ বসুর "প্রজাপতি" (১৯৬১ খ্রীঃ) উপন্যাসের জন্য তাঁকে যখন আদালতে যেতে হয়েছিল সেই দুঃসময়ে সমরেশ বসুর হয়ে বুদ্ধদেব বসুও আদালতে সশরীরে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় বুদ্ধদেব বসুর মন ও মানসিকতা ঐ ভাবনা আনার কতটা পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এই সময়কাল ও বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলি রচিত হয়। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলাদেশের পরিবেশ হয়েছিল ভঙ্গুর ও বিধ্বস্ত। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসগুলি এই সময়েই লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র কাব্যিকতাকে অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি আবর্তিত হয় নি, বরং ব্যক্তির নিঃসঙ্গতার আলাদা বৈশিষ্ট্য এই ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্র কিভাবে উঠে এসেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সমালোচক তাঁর উপন্যাসে সমাজ ও ব্যক্তি উপন্যাসের সীমানার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে আছে বলে যে অভিযোগ করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির দূরত্ব তাঁর উপন্যাসে অন্যভাবে এসেছিল। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে চরিত্রগুলি তাদের সামাজিক গণ্ডী

ও মানুষের কাছাকাছি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন বিশ্বাসের উপযুক্ত পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। চরিত্রগুলির নিজস্ব সত্ত্বা নিজের মনোজগতের মধ্যেই বারবার ডুব দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপন্যাসে ধনী জীবনের যে পরিচয় তুলে ধরলেন তাতে ধনী জীবন যাত্রার উদ্ভট খেয়াল ও বুঁর্জোয়া মানসিকতাকে কষাঘাত করেছে। মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব সমাজকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের উপন্যাসেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল। কারণ উপন্যাসের বিষয় ভাবনা সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্য আন্দোলন থেকে এসেছিল। এই থেকে সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে নূতন ভাবধারা। এই সময়কালে বাংলাদেশে রোমান্টিসিজমের যে ভরা জোয়ার এসেছিল, তাদের মধ্যে বুদ্ধদেব খানিকটা কক্ষচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথে আবর্তিত হতে থাকেন। এই ভাবধারা প্রকাশ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক স্বপ্নভাবাতুরতায় সূক্ষ্মতর কাব্য সৌন্দর্য্যে উপন্যাসকে যেন সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে সমাজ থাকলেও, সমাজের অনুশাসন সেখানে ছিল না। বুদ্ধদেবের বিষয় ভাবনা কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিকশিত হয়েছে। চরিত্রগুলি যেন দেহ কামনায় চির পিপাসিত কোন অজানা দেশের নারী পুরুষ। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের এই নারী-পুরুষ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে নাগরিক জীবনে নরনারীরা বিচরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিত। কেউ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, আবার কেউবা তরুণ অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশান্তিতে ভরা দূষিত সমাজের মধ্যে দিয়ে নর-নারীর অন্তঃসারশূন্য ভালোবাসার দিকগুলি বুদ্ধদেব তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এইভাবে সমগ্র উপন্যাস জগতের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ছিলেন। এছাড়া তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকে যে নূতন ধারা এসেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বুদ্ধদেবের মন অবশ্য সেই আদি পর্বের ঘটনা ও অনুভূতির ভেদরেখা বর্জিত মেঘলোকে গিয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে। ঐ পথের প্রবাহতেই সজীব ও সচেষ্ট ছিল তার গদ্যের কলম। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের ঘটনা দিয়ে কালের জলকে অনেকদূর গড়িয়ে দিয়েছিলেন। জীবনের জল বয়ে যায় কিন্তু সাহিত্যের জল অমর হয়ে থাকে। মনে হয় বুদ্ধদেব বসু এই ভাবেই জীবন ও সাহিত্যে দাগ কেটেছিলেন। বাংলায় রবীন্দ্রযুগের মধ্যেই রবীন্দ্র অনুভূতি বর্জন করে তিনি আলাদা জগৎ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য পিপাসা শুধু বঙ্গসাহিত্যই নয়, আর্ন্তজাতিক আধুনিক সাহিত্যের দিকেও পা

বাড়িয়েছিল। তার এই সাহিত্য অভিযান বহু পরিমাণে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই স্বপ্ন ও সংকল্প যে কল্লোল-প্রগতিত-কালিকলমেই নিহিত ছিল তা নয়, উত্তরবর্তী বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সদৃশ্য ও বিসদৃশ্যের তরঙ্গে সেই স্বপ্ন বিস্তার লাভ করেছিল। এই নূতনত্ব বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে মনের জগৎকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল। মননকে তিনি উপন্যাসের নর-নারীর মধ্যে তুলে ধরেছেন। সুপ্ত জীবনের পরিক্রমায় বাংলা উপন্যাসে তাঁর কল্পনার পাখা অধিকক্ষণ স্থায়ী না হলেও নবযুগ রচনায় এই কল্পনা ছিল নূতন ধারার বার্তাবহ। তাঁর লেখায় মানব জীবনের চকিত আভাস কিভাবে জীবনকে বিশ্বমানবের সঙ্গে এক করে দেয় তার প্রয়াস উপন্যাসে দেখতে পাই। এই প্রয়াস নবজীবনকে আনার, নূতনত্বের আঘ্রাণ জানানোর ইঙ্গিত মাত্র। বুদ্ধদেবের সাহিত্যে তাই স্বদেশ থেকে মুক্ত হয়ে যুগান্তরের পথ বেয়ে বিশ্ব সাহিত্যের মেল বন্ধনে অমরত্বের দাবীদার। এই প্রবাহের নব আলোকে আমরা বুঝতে পেরেছি বুদ্ধদেব বসুর জীবন ও উপন্যাসের বিষয় ভাবনা ও শিল্পরীতি ছিল বহুতল যুক্ত। এছাড়া তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর জীবনের প্রেক্ষাপটে প্রেমের কামনা-বাসনার শূন্যতা থেকেই উপন্যাসের বিষয় ভাবনায় এক নূতনত্বের কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় , যা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিরল।

উল্লেখ পঞ্জী

১) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, প্রথম প্রকাশ- ১ লা বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/ পৃষ্ঠা- ২৩০

২) বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) / বুদ্ধদেব বসু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- হরপ্রসাদ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, প্রকাশক ঃ আনন্দরূপ চক্রবর্ত্তী, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩/পৃষ্ঠা -৪৬-৪৭